Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.146-155
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার গণসঙ্গীতের পথপ্রদর্শক চারণকবি মুকুন্দদাস

ড.শান্তনু দলাই
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ

***Abstract**:*
In this article, an undisclosed aspect of the creative genius of 'Charankavi' Mukundadas has been highlighted. Although the content of the songs composed by Mukundadas was written in the context of the Swadeshi movement, there was an indomitable effort of mass uprising within the songs. We have tried to Revealed these songs in the genre of mass music without leaving it in the genre of conventional music. Because we can call the mass music that contains the purpose of mass uprising,. Attempts have been made to highlight the performance of Mukunda Das's Jatrapala and the use of Swadeshi songs and other aspects in that Jatrapala. His contribution to the mass uprising efforts in the remote areas of rural Bengal through Jatrapala is not to be forgotten. We have tried to judge the characteristics of folk music by combining the songs and other songs used in Jatrapala. These songs capture the context of contemporaneity, society and politics. Inspired by the language of the song to the anti-British Swadeshi movement. This article also discusses the ups and downls of the life struggle of 'Charankavi' Mukunda Das.)

Keywords: Charankavi, mass music, swadeshi movement, swadeshi song, jatrapala

সঙ্গীতের একটি অন্যতম ধারা হল গণসঙ্গীত, প্রধানত এই ধারাটি রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শোষণ-নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণমানসকে উদ্দীপ্ত করে। সমাজতান্ত্রিক ভাবনায় সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয়বাণী শোনা যায় এই গানে। এছাড়াও এই গান উৎপাদক স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষকে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী শোষণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করে। মোদ্দা কথা যে গানে শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত ও সংগ্রামশীল করে তোলার উৎসাহ জোগানো হয় এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার অর্জনের মাধ্যমে এক সাম্যবাদী সমাজ গড়ার আকাঙক্ষা ধ্বনিত হয় তাকেই গণসঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। গণজাগরণের গান গাওয়ার জন্য এদেশের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বাধীনতার অগ্রদূত গোবিন্দদাস, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, সত্য ও সুন্দরের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ, ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বরিশালের জন্মদাতা অশ্বিনী কুমার দত্ত, কবি হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং চারণকবি মুকুন্দদাস। ১৯২১ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশন যখন বরিশালে হয় তখন নবীন সন্ন্যাসী মুকুন্দদাস মণ্ডপে উচ্চকণ্ঠে এবং উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না

আসে তবে একলা চলো রে'। দশ হাজার লোক যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সেদিন গান শুনেছিলেন। তখন মাইক ছিলনা, কিন্তু বিরাট আসরে কারোর গান শুনতে কোন অসুবিধা হয়নি। একটু আগে যে আসরে গোলমাল হচ্ছিল মুকুন্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই উদ্দীপনামূলক স্বাধীনতার গান সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলো। মুকুন্দ তখন গাইলেন -

"জাগো - গো জাগো জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা,
আর কেহ জাগিবে না,
তুই না নাচিলে কারো নাচিবে না ধমনী"।।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী উচ্ছাস বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে স্ববিরোধী ভাবনাগুলিকে জাগিয়ে তুলেছিল, তার বাঙ্ময় এবং গীতময় আত্মপ্রকাশ যে মানুষগুলিকে বাহন করেছিল, চারণকবি মুকুন্দদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

চারণ কবি মুকুন্দদাসের গান আসলে গণসংগীত নাকি স্বদেশী গান এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের নিজস্ব বিশ্বাস থেকে স্বদেশী গান রচিত হয় না। এই ধরনের গানে একটা পরাধীন সার্বিক সর্বজনীয় বক্তব্য থাকে। স্বদেশের কিছু অতীত গৌরবের কাহিনী, বর্তমানের শোচনীয়তার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ এবং নবচেতনার জাগরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ-এই হল স্বদেশী গানের থিম। ত্যাগ, বীর্য, আত্মদান, বিদেশি দ্রব্য বয়কট, স্বদেশী দ্রব্যের সমাদর, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ইত্যাদি বিষয়বস্তু গানে ভরা থাকে। স্বদেশী গানের ভূমিকা ও সৃজনগত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন-

> "অবশ্য এটা ঠিক যে চল্লিশের দশকের আগে-পিছে যারা এদেশে মার্কসবাদী আন্দোলনে বা ব্যাপক অর্থে কমিউনিস্ট ভাবনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকে অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লববাদী দল-উপদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গণসংগীত রচনা বা গাইবার অব্যবহিত আগে চল্লিশের অনেক গণশিল্পী গাইতেন স্বদেশী সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত। তাদের স্মৃতিচারণ থেকে এই তথ্য পাই। কিন্তু বিশ আর ত্রিশের দশকে রচিত নজরুলের কিছু গানকে ব্যতিক্রমী ধরেই বলা যায়, বাংলা স্বদেশী সঙ্গীতের শ্রেণিসংগ্রাম বা রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা তেমন করে আসেনি, মজুতদার মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথাও আসেনি, আসেনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের উঁকিঝুঁকি। ঐতিহাসিক কালগত কারণেই আসেনি। কিন্তু গণসঙ্গীত যেভাবে হঠাৎ এল, সবরকম সম্ভ্রম আর ভাবাবেগে ভেঙে, তার দুর্বার বক্তব্য চমকে দিলো অনেককে"।[১]

অধ্যাপক চক্রবর্তী অন্যত্র বলেছেন-

> "স্বদেশী গানের ধারাপ্রবাহ বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনাকে আশ্রয় করে জেগে উঠে অনেক বছর চলল, কিন্ত ক্রমে পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন নানা আকারের ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ইংরেজের দমননীতি এবং ভারতীয়দের পাল্টা অহিংস ও সহিংস আন্দোলন উত্তাল করে তুলল সারাদেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমে আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক হতে বাধ্য করল। কিন্তু একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কোন

> গীতিকারের কণ্ঠে ও কলমে তখনও আমাদের নতুন ভাবনার গান তেমন করে জাগেনি। ১৯৪০ সালের আগে-পিছে, বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছুঁয়েই উঠে এসেছে বাংলার গণসঙ্গীত"।[২]

এর বহু আগে উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ছুঁয়ে স্বদেশী গানের ধারা পূর্ববঙ্গের পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে। মুকুন্দদাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও অশ্বিনীকুমার দত্তের অবদান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বদেশী গানের গণপ্লাবন এল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই গণসঙ্গীত ধারার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। পরে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্নস্তরে এর রচনায় ও উদ্দীপনায় গভীর শক্তি ও গতিবেগ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের মত সিদ্ধ গীতিকারগণ নেমে এলেন পথে। তাঁদেরই লেখা স্বদেশী গানগুলি প্রথম বাংলা গানের সঙ্গে পথের যোগ ঘটাতে সক্ষম হলো। এই সঙ্গীত আন্দোলনের ধারায় আর্বিভূত হন বাংলা উদ্দীপক সঙ্গীতের চারণকবি মুকুন্দ দাস ও কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিদার এই দুই সঙ্গীতকারই। ইংরেজদের বিরোধিতার জন্য এদের করতে হয়েছে শাস্তিবরণ। কিন্তু এদের গান রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও শোনা গেল। শোনা গেল শ্রমজীবী মানুষের ওপর পরিচালিত শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এদের গানেই উপজীব্য হয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশে প্রেমের গানের ধারায় এ এক নতুন মাত্রার শুভ সংযোগ সাধিত হলো। নজরুল রুশ বিপ্লবের কথা জানতেন। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রয়াস সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। কবিতায়, গানে, উপন্যাসে সাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তার গভীর আস্থার কথা তিনি বহুবার ঘোষণা করেছেন। উদ্দীপনামূলক গানে তিনি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষকে তাদের উপর শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হতে, সংঘবদ্ধ হতে ও রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এসব গান মূলত গণসঙ্গীত, কারণ এসব গানের ভিতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা ব্যক্ত হয়েছে। অত্যাচার ও শোষণের অবসান করার সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মুকুন্দদাসের গানের মধ্যেও গণবিপ্লবের ইন্ধন ছিল। শ্রেণীসংগ্রাম গণসঙ্গীতের মূল শর্ত হলেও তারমধ্যে মুক্তির আহবান ধ্বনিত হয়। মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলি প্রস্তুত হয় গণবিপ্লবের জন্য। ঠিক একইভাবে চারণকবি মুকুন্দদাসের স্বদেশী গানগুলিও গণবিপ্লবের ইন্ধন জোগাতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তাঁর গানের প্রবণতা ছিল শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার দাবী ও স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসক-শোষকের প্রতি তর্জনী প্রদর্শন। সেই অর্থে মুকুন্দদাস ও নজরুল উভয়েই বাংলা গণসঙ্গীতের পথপ্রদর্শক, তবে এ ক্ষেত্রে নজরুলের ভূমিকা অনেকখানি সচেতন ও অগ্রসরতর। গণসঙ্গীতের স্বর্ণযুগটি সূচিত হয় চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও শোষণহীন জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার সংকটাপন্ন সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শপ্রসূত আন্তর্জাতিকতাও এর প্রভাবে ভোঁতা হয়ে পড়ে। এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে শোষিত মেহনতি মানুষের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ গণসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। সমাজবাদ, বর্ণবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এই গান তীব্র প্রতিবাদ রূপে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এর অনেক আগে থেকেই স্বদেশীযুগে স্বদেশী পণ্য ব্যবহার ও বিদেশী পণ্য বয়কট করতে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গণবিপ্লবকে জাগিয়ে তুলতে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন ছিল। চারণকবি মুকুন্দদাস বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রাম্যমান থেকে তাঁর স্বদেশী গানগুলোর দ্বারা গণপরিসরে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছিলেন। নিজের প্রতিভার গুণে তৈরি করতে পেরেছিলেন এক শক্তপোক্ত গণমাধ্যম।

তাঁর গণসংযোগের অপর একটি মাধ্যম ছিল যাত্রাপালা আর দল গঠন। গণনাট্যের সূত্র ধরে যদি মুকুন্দ দাসের যাত্রাপালায় প্রযুক্ত গানগুলোর গুরুত্বকে আমরা বিচার করি তাহলে বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না যে তিনি কত বড় গণসঙ্গীতের গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলার সময় বরিশালের টাউন হলে অশ্বিনী কুমার দত্ত তার বক্তব্যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে জোরদার করার উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে সব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, যদি কেউ তা যাত্রাপালা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে, তাহলে তা আমাদের এরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে।' অশ্বিনী কুমার দত্তের সেই বক্তব্য মুকুন্দ দাস খুবই গুরুত্বসহকারে নিয়ে মাত্র তিন মাসের মধ্যে রচনা করেন অসাধারণ যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা'। যার মূল বিষয় ছিল দেশপ্রেম। দেশের সন্তানরা প্রয়োজনে জীবন দিয়ে ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করবে। পুলিন দাস, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস দেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করলেন তরুণ সমাজের মধ্যে। কালক্রমে বিপ্লবী অশ্বিনীকুমার দত্তের ছত্রছায়ায় এসে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন চারণকবি মুকুন্দ দাস। এরপর থেকে অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুকুন্দদাস গণমুখী সংগঠক হয়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বরিশালে তুমুল ইংরেজবিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভে মুকুন্দ দাস নিজে অংশ নেন ও ইংরেজবিরোধী অগ্নিগর্ভী বক্তব্য দেন। শুধু তাই নয়, একের পর এক গান, কবিতা ও নাটক রচনা করে বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে বিপ্লবের অনুরণন তোলেন।

১৯০৪ সালের দিকে কালিসাধক সোনাঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত হন মুকুন্দ দাস। ১৯০৫ সালে রচনা করেন প্রথম পালাযাত্রা '**মাতৃপুজা**'। আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী মুকুন্দ কারোর সঙ্গে পরামর্শ করলেন না। রচনা অপরকে শুনিয়ে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেননি। জীবনের দুর্গম পথ অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে মনকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। প্রচলিত যাত্রাপালার অনুকরণে 'মাতৃপূজা' যাত্রাটি অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশী ভাবনার প্রচার মানুষের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত যাত্রাদলের সাজ-সরঞ্জাম, গায়ক-বাদক, অভিনেতাদের দাদন-বেতন, যাতায়াত-খোরাকি, মূলধন নানাবিধ অর্থনৈতিক বিষয়ে মুকুন্দদাসের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। এছাড়াও যাত্রাদল করে সর্বস্বান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত মুকুন্দের কাছে অজানা ছিলনা। বুদ্ধিমানের পরামর্শ, বিদ্বান-পন্ডিত-ধনী ব্যক্তির সাহায্য তাঁর অনুকূলে যাবে না সে কথা তিনি জানতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে যতই অবিবেচক ও নির্বোধ বলুক না কেন তাঁকে যেকোন উপায়েই স্বদেশী যাত্রার দল করতেই হবে। সাফল্যের স্পষ্ট আশা মুকুন্দের রঙ্গিন মনকে ইন্ধন জুগিয়েছে সব সময়। তাঁর অদম্য চেষ্টা শুরু হলো। তিনি চেষ্টা করলেন সমস্ত রকম আলোচনা ও জিজ্ঞাসার সমস্যাকে এড়িয়ে চলতে। দলগঠনে লোক সংগ্রহের জন্য প্রথম যাত্রাদলের পেশাদার অভিনেতা, গায়ক-বাদক এর কাছে গেলে তারা মূলধন কে যোগাবে? কয় মাসের টাকা দাদন পাওয়া যাবে? নানান ফিরিস্তি করতে থাকে। এই কারনে তিনি সে পথে গেলেন না। এদিকে শ্রাবণ মাসের মধ্যেই যাত্রাদল ওয়ালারা উৎকৃষ্ট গায়ক-বাদকদের দাদন দিয়ে এগ্রিমেন্ট করে রাখেন। বিশিষ্ট যাত্রা দলপতিদের তোষামোদ করে দাদন ছাড়া কম পয়সায় বছরের জীবিকা সংস্থান করতে লাগে সাধারণ অভিনেতারা। কিন্তু মুকুন্দের উল্টো ব্যবহারে কেউ বিশ্বাস করে রাজি হলো না। অথচ যাত্রাদলের রীতি অনুসারে দুর্গাপূজায় নতুন গান শুরু করতে হয়। নতুন পালার রিহার্সেল ভাদ্র মাসের শেষেই আরম্ভ হয়। এখনো মুকুন্দের লোক, সাজ, যন্ত্র, অর্থ কিছুই নেই অথচ

পূজার দল প্রস্তুত করতে হবে। কাজ খোঁজার পর বিভিন্ন ভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর যাদের কোন দলে কেউ নিতে চায় না, যারা কোনদিন যাত্রাদলে যায়নি অথচ একটু-আধটু গান গাওয়ার শখ আছে এই ধরনের লোকের সন্ধান করে মুকুন্দ কয়েকজনকে সংগ্রহ করলেন এবং কাশিপুর গ্রামে 'মাতৃপূজা'র অভিনয় আরম্ভ করলেন। শহরের বাসা থেকে সন্ধ্যায় খেয়ে-দেয়ে কাশিপুর গ্রামে গিয়ে রাত্রে মহড়া করে শেষ রাত্রে আবার শহরে ফিরে আসতে হতো। দিনের বেলায় দলের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ করতেন। মুদি দোকানের দায়িত্ব বাবা ও ভাইয়ের হাতে দিয়ে সেদিক থেকে তিনি অব্যাহতি নিয়েছিলেন। মাসাধিককাল নিদ্রা-বিশ্রামের কোনো সুযোগ ছিল না। অতি কষ্টে কুড়ি জন লোক সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তের জন মাত্র টিকে ছিলো। এক একটি যাত্রাদলে প্রতিবছর পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে গিয়ে হাজার টাকা ব্যয় হয়। সেক্ষেত্রে মুকুন্দ কিছু পুরোন কাপড় সংগ্রহ করে গেরুয়া, লাল, কমলা, রঙে রাঙিয়ে নিতেন। কীর্তনের হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, কর্তাল নিজের ছিল। এছাড়া বেহালা ও তবলা ওই লোকদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। পুজো আর কয়েকটি দিন বাকি আছে এখনও কোন বায়না স্থির হয়নি। কিন্তু যাত্রাদল প্রস্তুত। নৌকায় দল নিয়ে যেকোন দিকে রওনা দেবেন এই ভেবে নৌকাঘাটে একটি বড় নৌকা ভাড়া করতে গিয়ে দেখলেন মাসকাবারি ষাট টাকা দিতে হবে। মাঝিহীন ভাঙ্গা নৌকা মাসিক কুড়ি টাকায় ভাড়া করলেন এবং দলের মধ্যে একজনকে দাঁড়ি করলেন। নিজের মুদি দোকান থেকে কিছু চাল-ডাল সঙ্গে নিয়ে অধিবাসের রাত্রে বাবা মাকে প্রণাম করে অতি গোপনে নৌকায় উঠলেন। মুকুন্দদাস মাঝি এবং অপর এক যাত্রী দাঁড়ির স্থান অধিকার করল। পশ্চিম দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নিজের জেলার গ্রামগুলোতে সেই কয়েকটা দিন গান হয়েছিল। তাঁদের সামর্থ্য ছিল ক্ষুদ্র। এছাড়াও নিজেদের প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা এবং মুকুন্দের অপরিচিতি ইত্যাদি কারণে দর্শকের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট নগণ্য। মুকুন্দদাস তাঁর গানে উক্ত অঞ্চলের নর-নারীর স্নেহ-প্রীতি-আত্মীয়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন। ইদিলপুর গ্রামে যাত্রাপালা তখন জমে উঠেছে। এক মাসের মধ্যেই ভাড়া সহ নৌকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে নদীর পাড়ে বাসা করলেন। সে বছর ইদিলপুর পরগনায় প্রত্যহ গান চলেছিল। মহিলারা চাঁদা তুলে পাড়ায়-পাড়ায়, বাড়ি-বাড়ি গান গাওয়া করাচ্ছিলেন। 'মাতৃপূজা' পালায় সেই একই সঙ্গীত ও কাহিনী প্রত্যহ শুনেও দর্শক আনন্দ লাভ করে এবং পুনরায় শুনতে চায়। সাধারণ যাত্রাদলে অনেক পালা থাকে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা নতুন পালা গায়। কিন্তু মুকুন্দের সম্বল ছিল মাত্র একটি পালা। তবে মাঝে মাঝে সাময়িক ঘটনা সম্পর্কিত নতুন নতুন সংগীত ও বক্তৃতা যুক্ত হতো। বাজনার সুর চলছে মুকুন্দ হঠাৎ গানটা একটু থামিয়ে সাময়িক সংবাদ প্রচার করতেন। অথবা কিছু সময় বক্তৃতা দিয়ে গানের সঙ্গে নতুন কলি যুক্ত করে সেই গানকে পুনরায় শুরু করতেন। তখন শ্রোতার কাছে গানগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। অত্যাচার, পীড়ন, শাসন, লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে শ্রোতার মনে সাহস সঞ্চার হতো। গানগুলির মধ্যে সহজবোধ্য একটি গান জনসাধারণের মুখেই শোনা যেতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিদেশি শাসকের নির্মম নির্যাতনে মুকুন্দদাস একটুও দমিত না হয়ে তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট্ স্যার বামফিল্ড ফুলার সাহেব কে উদ্দেশ্য করে বজ্রকণ্ঠে গাইলেন -

"ফুলার আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে মনতো অধীন নয়
হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি
ধরে না হয় জেলে দিবি
মনকে বান্ধিতে পারে তেমন শক্তি নাই"।[৩]

মুকুন্দের 'তাজা প্রাণপ্রবাহ সংগীতের সুরে ভাষায় মূর্ত করিয়া তুলিত। তিনি যদি শুধু গানের আসরে নিবদ্ধ থাকিয়া কর্তব্য পালন শেষ করিতেন তাহা হইলে ইতিহাস তাহাকে তুষের মতো ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্মৃতিকে নিষ্কৃতিদান করিত। মুকুন্দ-জীবনের উপাদান ও গতিভঙ্গী সেই গতানুগতিক পেশাদারীর অতীতে বা উর্ধ্বে বিচরণ করিত বলিয়াই ভাবি বংশধরেরাও মুকুন্দ স্মৃতির কাছে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।'[৪] সেই সময় মুকুন্দের বিশ্বাসী কয়েকজন বন্ধু বলেছিলেন যে, আপনি বরিশালে গান করুন এবং পরে কলকাতায় গিয়ে গান শোনান। ইংরেজের বিরুদ্ধে কলকাতার মানুষকে সংঘবদ্ধ করুন। প্রত্যুত্তরে মুকুন্দ নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গর্জন করে বলেছিলেন-

> "একটু সবুর করো। এদিক-ওদিক যামু, একটু ঢিব কইরা বরিশালের ধুলা মাথায় মাখুম, তারপর একদম শিয়ালদা স্টেশনে নাইম্যা কলিকাতাখান ধইরা একটা টান দিয়া ঝাঁকি দিমু। সেই ঝাঁকিতে গোটা বাংলাদেশ কাঁইপ্যা উঠবো"।[৫]

কালক্রমে লিখলেন 'সমাজ' নামের একটি পালা। বুঝলেন কলকাতায় যেতে হবে। সেখানকার মানুষকে শোনাতে হবে তাঁর গান। ততদিনে আবার ডাক আসতে শুরু করেছে। একদিন চার টাকায় আসরে পালা গাইতেন। এখন নাম হয়েছে। রেট দাঁড়িয়েছে পঁচিশ টাকা। 'সমাজ' পালায় তিনি বিষয়বস্তু করে তুললেন সমাজের বিভিন্ন খারাপ দিকগুলিকে। পণপ্রথা, জমিদারদের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। একদিন জোড়াসাঁকোয় কবিগুরুর বাড়িতে গিয়ে তিনি গান শোনালেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে মোহিত রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁকে শিখিয়ে দিলেন তাঁর 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' এই গানটি। বললেন, 'মঞ্চে মঞ্চে তুমি এই গানটি গেও'। নজরুলের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিও তাঁর গান শুনে মুগ্ধ। কবি নিজেও শোনালেন তাঁর গান। 'কারার ওই লৌহকপাট' ও অন্য কয়েকটি গান। মুকুন্দদাসকে উপহার দিলেন তাঁর দুটি বই। 'অগ্নিবীণা' এবং 'বিষের বাঁশি'। তাতে লিখে দিলেন, 'চারণসম্রাট মুকুন্দদাসকে উপহার'। মুকুন্দদাস হয়ে গেলেন 'চারণকবি'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ের বিয়ে। দেশবন্ধু চিঠি লিখলেন অশ্বিনী দত্তকে। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি পালাগানের আসর বসাবেন। সেখানে মুকুন্দদাসকে গাইতে হবে। সেই আসরে গান গেয়ে সাড়া ফেলে দিলেন তিনি। সেখানে তিনি ইংরেজ বিলাসিতায় আসক্ত আধুনিক মহিলাদের ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিলেন। গানের শেষে দেশবন্ধু তাঁকে পরিয়ে দিলেন সোনার মেডেল। সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন কবি প্রিয়ংবদা দেবী। তিনি কবির প্রশংসা করে তাঁকে উপহার দিলেন সোনার সেফটিপিন। সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিস কমিশনার। তিনি আড়ালে ডেকে মুকুন্দদাসকে বললেন, 'দারুণ গান করেছেন। তবে আর নয়। এবার কলকাতা ছাড়ুন। আপনাকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা চলছে।' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর গান পছন্দ করতেন। তিনি মুকুন্দদাসকে উপহার দিয়েছিলেন একটি রুপোর লাঠি।

তাঁর 'পল্লিসেবা', 'কর্মক্ষেত্র','পথ','সাথী', 'ব্রহ্মচারিণী' প্রভৃতি পালার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রুপে বিদ্ধ করেছেন অসাম্য, অন্যায় আর শোষণকে লক্ষ্য করে। জমিদার বাড়িতে গানের আসরে তিনি জমিদারি ব্যবস্থার খারাপ দিকগুলিকে তীব্র ব্যঙ্গ করতেও ভয় পেতেন না। প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের একটি অংশ তুলে ধরা যায়-

> "তাঁর যাত্রাপালা ছিল ভিন্নধারার। ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়ের মতো তিনি পালা রচনা করেননি। তাঁর পালায় ছিল গানের আধিক্য। সেই গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলে

তিনি যেন নবনাট্যের প্রস্তাবনাও করে গিয়েছিলেন। একইসঙ্গে যাত্রাপালা এবং স্বাধীনতার আন্দোলনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য"।[৬]

তাঁর 'মাতৃপূজা' যাত্রাপালাটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের ধারাকে আরও জাগরিত করেন। ওই যাত্রাপালার পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করে তৎকালীন পুলিশ। ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তার হন মুকুন্দদাস। জেল খেটে ১৯১১ সালের প্রথমভাগে দিল্লি কারাগার থেকে ছাড়া পান। এর মাঝেই স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। জেলফেরত মুকুন্দ অল্প ব্যবধানে আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন গান-যাত্রাপালা নিয়ে মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে বিপ্লবীর বেশে। মুকুন্দদাসের যাত্রাপালা ও গান রীতিমতো ব্রিটিশ শাসকের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে।

মুকুন্দ দাসের প্রকাশিত গানের সংখ্যা শতাধিক। অধিকাংশ মুকুন্দের গানগুলি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল। মুকুন্দদাস তাঁর যাত্রায় যে গানগুলি ব্যবহার করেছেন তা কতখানি গণোউদ্দীপক সে সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করেছি। এই অংশে আমরা মুকুন্দদাসের স্বদেশী গানগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই। এই গানগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে যে গণজাগরণের আহ্বান আছে এবং গণ-অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত আছে সেগুলির বিশেষত্ব অন্বেষণের চেষ্টা করবো।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে মরা গাঙ্গে বান ডেকে উঠলো। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুকুন্দের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকৃত হয়ে উঠল শক্তি সাধনার গান। সেই গান বঙ্গজননী কে শক্তিরূপা মূর্তিতে কল্পনা করলেন এবং হিন্দু-মুসলমানকে একইসঙ্গে প্রস্তুত হতে বললেন স্বাধীনতার জন্য-

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।।
সাজ রে সন্তান হিন্দু-মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়া কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিওরে সঙ্গে"।।
(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২০৫)

রাম-রহিমের সম্প্রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনের চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর অপর একটি গানে-

"রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটি রাখ জী।
দেশের কথা ভাব ভাইরে,
দেশ আমাদের মাতাজী।।

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন কর জী;
দু'ভাইয়েতে দু'ঘর বেঁধে,
করি একই দেশে বসতি।।
টাকায় ছিল আট মন চাউল ভাই,
এখন বিকায় পোয়া পসারি।
এরপরেতে হতে হবে গাছের তলায় বসতি"।।
(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২৪৭)

অথবা আরেকটি গানে দশ হাজার বাঙালির প্রাণ উৎসর্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন ফিরিঙ্গি বণিককে হটানোর জন্য-

"আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম।
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি-
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।।
শোন সব ভাই স্বদেশী,
হিন্দু-মোছলেম ভারতবাসী।
পারি কিনা ধরতে অসি,
জগতকে তা দেখাইতাম।।
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,
সেজে আয় বীর সাজে।
দাস মুকুন্দ আছে সেজে,
দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম"।।
(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২৬১)

কিংবা আরেকটি গানে আমরা লক্ষ্য করি-

"কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে,
তখনই উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান"।
(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২১১)

মুকুন্দদাসের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতো বিপ্লবের আগুন। বাংলা মায়ের বীর সন্তানদের জন্য তার বুকটা গর্বে ফুলে উঠতো। এইরকম গৌরবগাথা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি অনবদ্য গানে-

"আবার যখন গান ধরেছি, গাবো গো সেই গান।
বুকটা যাতে ফুলে উঠে, শিরায় যাতে অগ্নি ছোটে-
তন্দ্রা যাতে যায় গো ছুটে, মাতায় যাতে প্রাণ।।
অগ্নিগিরির গর্ভ মাঝে সাগর গর্জনে,

সিংহনাদে ঝড়ের বুকে মেঘের তর্জনে-
এদের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে যে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে প্রলয় অভিযান"।।

(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২১৩)

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সামিল হতে বলেছেন। সবাইকে পণ করে কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়বার কথা বলেছেন। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশের মানুষ যেভাবে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে বাঙালিকেও ঠিক সেইরকম কর্মঠ হতে হবে। কেরানিগিরি না করে ইংরেজ নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে ভাত-কাপড়ের সংস্থান করার জন্য বাঙালিকে আহ্বান জানালেন। কায়িক শ্রমের দ্বারা স্বাবলম্বী বাংলা গড়ার ডাক দিলেন মুকুন্দদাস-

'পণ করে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত।।
মাড়োয়ারি দিল্লিওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটিয়ারা,
তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত।।
যেদিকে চাই বাংলাদেশের,
(আজ) সকল দিকই করছে গ্রাস,
তোরাই শুধু কেরানীর দল,
এক বোড়ের চালেই হলি মাত।।
এমন করে পরের হাতে
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ।
ধিক্ বাঙালি নীরব রইলি,
থাকতে কোটী কোটী হাত।।'

(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২১৭)

স্বদেশের জীবন-জীবিকার উপর আস্থা রেখে বিদেশী পণ্যের বয়কটের কথা বারবার মুকুন্দদাস তাঁর গানে বলেছেন। মানুষের স্ব স্ব পেশায় গুরুত্ব দিয়ে তিনি লিখেছেন গান। সমাজের মধ্যে হাড়ি, মুচি, মেথর ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের প্রতি ঘৃণা না করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সকল গানের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্যের বিভেদ রেখা মুছে যায়। মিলেমিশে একাকার হয় সকল স্তরের মানুষ-

"সকল কাজের মিলবে সময়,
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর,
তোরা পেটের জোগাড় কর্।।

মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ,
কসে লাঙ্গল ধর্।।
ডেকে নে তাঁতী জোলা,
ছাড়িয়ে নেংটি তিলক ঝোলা,
খুলে দে তাঁতের মেলা প্রতি ঘর ঘর।।
কামার কুমার চামার মুচি,
তারাই কাজের তারাই শুচি,
ধরিয়ে জড়িয়ে গলা তাদের ভুলে আপন পর"।।

(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২২১)

একই ভাবে অন্যত্র কবি তাঁর একটি গানে ধনী-নির্ধনের মান-অভিমান রাখতে না বলেছেন এবং জাত-বেজাতের বৈষম্য ঘুচে ফেলার কথা বলেছেন-

"আমরা বিচার করে চলবো না।
মান-অভিমান রাখবো না
ধনী কি দীন বাছবো না।।
আমরা মোদের ভাই চিনেছি
এখনো কি নেটিভ আছি-
ইউনিটি সার করেছি
কারেও কেউ ছাড়বো না।।
হিন্দু পার্শী জৈন সাঁই
মুচি ডোম মেথর কসাই-
আমরা সকলেই এক মায়ের ছেলে
এই মহামন্ত্র ভুলবো না"।।

(চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী, পৃষ্ঠা ২৫৮)

সুতরাং স্বরাজ আনতে গেলে শ্রেণি উত্থানের প্রয়োজন। সকল শ্রেণীর সমান অংশীদারিত্বের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন চারণ কবি মুকুন্দদাস। নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, জাতি-বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ একই সারিতে এসে দাঁড়ালে তবেই হবে দেশের প্রকৃত মঙ্গল। মুকুন্দদাসের এই গানগুলি গণসচেতনতার অনবদ্য দলিল হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা গণসঙ্গীতের রূপকার হিসাবে তাঁকে মর্যাদা দেবো।

তথ্যসূত্র:

১. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা গানের চার দিগন্ত, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩,পৃষ্ঠা: ৫৭।
২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৩।
৩. জয়গুরু গোস্বামী, চারণকবি মুকুন্দদাস, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭২,পৃষ্ঠা: ৭৪।
৪.তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৫।
৫.তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৭।
৬.সন্দীপন বিশ্বাস, প্রবন্ধ: মুকুন্দ দাস ও তাঁর স্বদেশী যাত্রা, 'বর্তমান' পত্রিকা, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃষ্ঠা: রঙ্গভূমি।